অপারেশন ক্লিন হার্টের ফলাফল

মেজর জেনারেল (অবঃ) মনজুর রশীদ খান

দেশে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে পরিচালিত যৌথ বাহিনীর অপারেশন ক্লিন হার্ট শেষ পর্যায়ে। ৮৭ দিন এই অভিযান পুরোদমে চলেছে। প্রায় ১২ হাজার সন্ত্রাসী ও অপরাধী চক্রের সদস্য ধরা পড়েছে। অনেক রাঘব বোয়াল ধরনের সন্ত্রাসী আত্মগোপন করে আছে এবং কেউ কেউ বিদেশে আশ্রয় নিয়েছে। কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ প্রায় ৩০ হাজার বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এই অপারেশনের তাৎক্ষণিক ফলাফল দেশবাসীর মনে যথেষ্ট স্বস্তি ও আশার সঞ্চার করেছে। গত তিন মাস সাধারণ মানুষ জিম্মি ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং অপহরণ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনেকটা কমে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আটকের পর ৪২-৪৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় দেশে-বিদেশে সমালোচনা চলছে। এতে অপারেশনের সুফলে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে অনেকটা ম্লান করে ফেলেছে। সেনাবাহিনী নামানো নিয়ে শুরু থেকেই অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। অনভিপ্রেত বাড়াবাড়ি, নির্যাতন ও মৃত্যুর মতো দুঃখজনক ঘটনার খবরে অনেকেই বিক্ষুব্ধ বা দুঃখিত। সরকার ৯ জানুয়ারি ২০০৩ 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ' জারি করে অভিযানে নিয়োজিত সকল বাহিনীর সদস্যদের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডকে দায়মুক্ত (ইনডেমনিটি) করেছে। এখন সমালোচনা আরো বৃদ্ধি পেল। মূলত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটেছিল তা রোধ করতে সরকারের পক্ষে কিছু একটা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এমন একটি পরিস্থিতিকে তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা ছাড়া সরকারের পক্ষে আর কোনো বিকল্প ছিল না। এ ক্ষণে সরকারকে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের কর্মকাণ্ডকেও দায়মুক্ত করতে হলো। যেকোনো দায়িত্বশীল সরকারকেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না। তবে তা অধ্যাদেশের মাধ্যমে না সংসদে বিল উত্থাপনের মাধ্যমে করা উচিত ছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে।

অপারেশন ক্লিন হার্ট চলাকালে যৌথ বাহিনীর কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও প্রাণহানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তদের ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতের প্রক্রিয়ায় আনা হতে থাকলে বিভিন্নমুখী সমস্যার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বাহিনীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এবং সদস্যদের মনোবলের ওপর প্রভাব পড়বে। জাতীয় স্বার্থ ও স্থিতিশীলতার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত এসব বিবেচনায়ই সরকারকে এই অধ্যাদেশ জারি করতে হলো। তবে সরকারের পক্ষে যা করণীয় তা হলো সংশ্লিষ্ট বাহিনীকে সকল অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া। সংশ্লিষ্ট বাহিনী নিজ নিজ আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী অভিযোগের তদন্ত করে শাস্তির বিধান করবে। শোনা যায় যে, ইতিমধ্যেই এ ধরনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা নির্দেশ অমান্য করার জন্য সামরিক বাহিনীতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বাহিনীর স্বার্থে শৃঙ্খলা এবং সুনাম রক্ষার প্রয়োজনেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। উল্লেখ্য, অভিযানের প্রথম দিকে আটক অবস্থায় নির্যাতন ও মৃত্যুর কিছু ঘটনা পত্রপত্রিকয় প্রকাশ হওয়ার পর সেনাপ্রধান বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শনে যান এবং বাড়াবাড়ি, নির্যাতন ও প্রাণহানির মতো ঘটনার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করেন বলে খবরে প্রকাশ। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সশস্ত্র বাহিনীর টপব্রাশদের সম্মেলন ডেকে এমন সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটার নির্দেশ দেন। লক্ষণীয় যে, এরপরও অবস্থার উন্নতি হয়নি। ঘটনা ঘটতেই থাকে। এমনকি অভিযান গুটিয়ে ফেলার নির্দেশের কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ৬ জানুয়ারি কালিয়াকৈর থানার সফিপুরের এক পোলট্রি ব্যবসায়ী স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটক হয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে ৮ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন বলে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়। এতে এক শ্রেণীর সদস্যের ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশ অমান্য ও কর্তব্যে অবহেলার ইঙ্গিত বহন করে। সামরিক বাহিনীতে এমন শৃঙ্খলাবিরোধী প্রবণতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

টপব্রাশদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘের শান্তি মিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত হয়ে আসছে এবং এ যাবৎ সুনাম অর্জন করে চলছে। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো যেসব অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তাতে এই সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ক্ষণে শৃঙ্খলা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সুনাম রক্ষা করতে হবে। এতে জনগণের আস্থা

বাড়বে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। সেনা ও নৌবাহিনীর এই অভিযান পরিচালনায় কিছু দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়েছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পুলিশি কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ ও অভিযোগের তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ার বিষয় অনভিজ্ঞ। তাদের অনেকটাই পুলিশের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। শোনা যায়, কোথাও কোথাও পুলিশের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। আবার কোথাও স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। কাজেই পুরো অভিযানের একটি সর্বাঙ্গীণ তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তের লক্ষ্য হওয়া উচিত অপারেশনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা, আইনি বিষয় প্রভৃতি চিহ্নিত করা। তদন্তে উ"ঘাটিত তথ্য এবং সুপারিশ সরকারকে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে সাহায্য করবে।

এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অপারেশন ক্লিন হার্টের ফলাফল বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা; আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা নির্ণয় করা। অভীষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছলেও যথার্থ বলা যাবে। যৌথ অভিযান সার্থক হয়েছে বলে ধরা যাবে, যদি সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর দেশের শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে। যদি সন্ত্রাসী, দুষ্কৃতকারী ও তাদের গডফাদাররা আবার সক্রিয় না হয়ে ওঠে। এখানেই বড় সন্দেহ। অবস্থার অবনতি হওয়ার আশঙ্কাই সবার মনে। আত্মগোপনকারী ও বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারীরা সময়মতো ফিরে আসবে এবং মাঠে নামবে, হয়তো বা আরো দুর্দান্ত ও দুর্বিনীত হয়ে উঠবে। শান্তিশৃঙ্খলার অবনতির মূল কারণগুলোকে অপসারণ করা না গেলে স্বল্প সময়ের কড়া ডোজেও কাজ হবে না। সেনাবাহিনীকে সন্ত্রাস দমনে নামিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ও শক্ত মনোভাব দেখিয়েছেন। সাময়িক হলেও এতেই এখন পর্যন্ত অভিযানের সাফল্য দেখা গেছে। এই সাফল্য অনেকটা ধরে রাখা সম্ভব হবে যদি শান্তিশৃঙ্খলার অবনতির মূল কারণগুলোকে অপসারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী একই রকম মনোভাব রাখেন। এই অভিযানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুটি উল্লেখযোগ্য হুঁশিয়ারি সংকেত দিতে পেরেছেন। প্রথমত, তিনি তার দলের যারা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন, পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনেন এবং নানা অপকর্মের নেপথ্যে উৎসাহ দেন তাদের হুঁশিয়ার করেছেন। ক্ষমতাসীন দলের বহু নেতা-কর্মীকে জেলে যেতে হয়েছে। তিনি কারো তদবির-সুপারিশ শোনেননি। সেনাবাহিনীকে টাস্ক দিয়েছেন এবং তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেননি এবং অন্য কাউকেও নাক গলাতে দেননি। এতে দলের মধ্যে কিছু গুঞ্জন উঠেছে কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি সন্ত্রাসী, তাদের দোসর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি মহলকে আরেকটি বার্তা দিতে পেরেছেন। তা হলো অবস্থার অবনতি হলে আবারও সেনাবাহিনীকে তলব করা হবে। এতে শান্তিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো পুলিশ বাহিনীর দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক মহল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক অপরাধী শ্রেণীকে লালনপালন এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া। দেশের জনগণ রাজনীতিবিদ ও পুলিশের ওপর দারুণভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। আসলে রাজনীতিকদের সন্ত্রাসী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা সম্ভব না হলে অপরাধী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা যাবে না, এটাই দিবালোকের মতো সত্য। অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে। এই বাহিনী এখন দুর্নীতি, অদক্ষতা, অযোগ্যতা এবং অকর্মন্যতার মতো দোষাবলিতে জর্জরিত। তাদের চেইন অব কমান্ড অতি দুর্বল, দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দারুণ অভাব রয়েছে। পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবমুক্ত করতে হবে, দলীয়করণ এবং দলের স্বার্থে কাজ করা বন্ধ করতে হবে। পুলিশ বাহিনী যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এখন যৌথ বাহিনীর অভিযান শেষ হলো। দেশবাসী শিগগিরই বুঝতে পারবে পুলিশ বাহিনী কতটুকু কার্যকর। অভিযানে সেনাবাহিনীর হাতে শত শত সন্ত্রাসী, দুষ্কৃতকারী আটক হয়েছে। এদের বেশিরভাগই পুলিশের তালিকাভুক্ত। সেনা ক্যাম্পগুলো স্থানীয় পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও নিজস্ব সোর্সের ভিত্তিতেও কাজ করেছে। এখন দেখা যাবে কজন অভিযুক্ত আসামি জামিন নিয়ে বের হয়ে আসে, কজনের মামলা আদালতে টিকবে এবং কজনের শাস্তি হবে। আমাদের ধারণা, বেশির ভাগ আসামিই খালাস পাবে। কারণ যে প্রক্রিয়ায় এদের ধরা হয়েছে তাতে আইনগত দুর্বলতা থাকছে। পুলিশি তদন্তে ফাঁকফোকর থাকবে। যেহেতু আটককারী কর্মকর্তাদের (এখানে সেনা সদস্য) কেউ মামলায় সংশ্লিষ্ট থাকবেন না; কাজেই সাক্ষী-আলামত প্রভৃতি যা আদালতের বিবেচনার জন্য প্রয়োজন তা উপস্থিত করা যাবে না। অপরাধীদের শাস্তি না হলে শান্তিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে না।

দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজনীতিবিদদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ মাস্তান বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কর্মী, ক্যাডার বা একটিভিস্ট নামে এই গোষ্ঠী ছাড়া তাদের পলিটিক্স করা হবে না। এদের পুষতে অর্থের দরকার হয়। এই অর্থের যোগান দিতেই ছেড়ে দিতে হয় বা সাহায্য করতে হয় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই প্রভৃতি ধরনের কার্যকলাপে। এগুলোরই জের ধরে এরা এককালে বড় অপরাধী হয়ে খুন-রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। হরতাল, মিটিং, মিছিল করতে এমন কর্মীদেরই কদর বেশি। আর নির্বাচনের সময় তো কথাই নেই। এরাই কারচুপি, ভোট চুরি আর মাস্তানি করে নেতাকে জেতাবে। এই শ্রেণীকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে বহিস্কার করতে হবে এবং পুলিশের সঙ্গে রাজনীতিবিদ এবং সন্ত্রাসী শ্রেণীর যে সখ্য ও আঁতাত বিদ্যমান তা গুঁড়িয়ে ফেলতে হবে। সচেতন মহলের অভিমত, সন্ত্রাস দমনে বা নির্মূল করতে হলে প্রথম করণীয়ই হলো 'ক্লিন পলিটিক্স'। তবে পলিটিক্স ক্লিন অর্থাৎ রাজনীতি পরিশুদ্ধ করতে প্রথম কাজটি হলো রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এটি সম্ভব না হলে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সুশাসন, সুখশান্তি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে কথা বলা বা আশা করা বৃথা।

১২-০১-২০০৩

মেজর জেনারেল (অবঃ) মনজুর রশীদ খান : সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সামরিক সচিব, (১৯৮১-৯১)।

****